কথামৃতের উপমা ও তার তাৎপর্য

চিত্রা মিত্র

সাহিত্যের জগতে বহুশ্রুত একটি প্রবাদবাক্য হল—'উপমা কালিদাসস্য'। বহুদিন ধরে এ-বাক্যটি গৃহীত হলেও পরবর্তী কালে মহাকবি কালিদাসের পরিবর্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করলেন একালের বিখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। স্বচ্ছন্দে সগর্বে বলে উঠলেন, 'উপমা রামকৃষ্ণস্য'। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমার তুলনা নেই, প্রাচুর্যে বৈচিত্র্যে তিনি কালিদাসকেও ছাপিয়ে গিয়েছেন। খ্যাতিমান সাহিত্যকার সৈয়দ মুজতবা আলিও ওই একই কথা বলেছেন। আর 'কথামৃত'-পাঠে মুগ্ধ গুণিজন ও ভক্তমণ্ডলী? সকলেই এ-সম্পর্কে বিমুগ্ধচিত্তে নিত্য নিয়মিত সেই একই কথা বলে চলেছেন।

সকল ধর্মগুরুই উপমা বা গল্পের সাহায্যে আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করে থাকেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মধ্যে বিশেষ। তাঁর সঞ্চিত উপমার ভাণ্ডার অফুরন্ত। বহুদিনের বহু সাধনা ও উপলব্ধির বাণীরূপ তাঁর কথামৃত। সেই উপলব্ধির উৎস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর উপমাগুলি। তারা যেন এই ধূলির ধরণী থেকে উৎসারিত হয়ে অন্তরিক্ষ ভেদ করে অনন্তে মিলেছে পরম সত্তার স্পর্শলাভের আশায়। শাস্ত্রের কথাগুলিকে লৌকিক ভাষায়, সহজ সরল নিজস্ব ভঙ্গিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যক্ত করেছেন, সেইসঙ্গে গ্রামীণ জীবনের চিরপরিচিত ছবিগুলি উপমারূপে যুক্ত হয়ে তাঁর বাণীকে করে তুলেছে উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। বস্তুত সহজ সরল ভাষায় কথিত, পল্লি-অঞ্চলের প্রতিদিনের সাদামাটা জীবন থেকে উঠে আসা উপমাগুলি শুধু তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতবচন বলেই নয়, নিজেদের সারল্যে, স্বাভাবিকতায়, সামঞ্জস্যতায়, বিশ্বস্ততায় ও তাৎপর্যে অনির্বচনীয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র একটি বড় আকর্ষণ তারাই—একথা অনস্বীকার্য। তদুপরি আছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাচনভঙ্গি। এক-একটি উপমাকে কেন্দ্র করে নির্বাচিত শব্দরাশির সাহায্যে অবলীলায় মুখের কথায় তিনি ছবি এঁকেছেন। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। শাস্ত্রের কঠিন তত্ত্বকে, অধ্যাত্মজগতের পরমসত্যকে সর্বসাধারণের কাছে মেলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। সে-তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়, তাই দৃশ্যমান জগতের ছবিকে উপমায় পরিণত করে তার সাহায্যে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন দর্শনের চিরন্তন সত্যকে।

সাধারণত দুটি কারণে সাহিত্যে উপমার ব্যবহার হয়। তার একটি হল বাক্যকে অলংকৃত করা। উপমা বহুলপরিচিত একটি জনপ্রিয় অলংকার। এর ব্যবহার শুধু সাহিত্যের পাতাতেই সীমাবদ্ধ নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষের মুখের কথায় এর অনায়াস

উপস্থিতি। আর দ্বিতীয় কারণটি হল, কঠিন কথাকে তুলনামূলক উদাহরণের সাহায্যে সর্বজনের কাছে বোধগম্য করে তোলা। কোনও তত্ত্ব বা দর্শনকে সহজ-সরলভাবে সকলের কাছে পরিবেশন করতে হলে জাগতিক কোনও বস্তু বা ঘটনার উপমার দ্বারাই তা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তাই প্রথম কারণটি অপেক্ষা দ্বিতীয় কারণটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা ভালভাবে বুঝতেন, এবং সেই কারণেই এমন জীবনভিত্তিক যথাযোগ্য উদাহরণ তুলে এনে তাকে শাস্ত্রবচনের সঙ্গে মিলিয়ে সার্থক উপমার পরিবেশন করেছেন কথায় কথায়।

সন্ধান করলে দেখতে পাব ঠাকুরের বহু কথাই আছে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে। শাস্ত্রের বাণী তাঁর মুখের কথায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সত্যে প্রতিষ্ঠিত যাঁর জীবন তাঁর কোনও কথাই 'কথার কথা' হতে পারে না। জীবনের উত্তাপে বেদান্তের কঠিন তত্ত্বকে গলিয়ে তিনি ঢেলেছেন মানবচিত্তে। তাঁর পারমার্থিক চিন্তারাশি যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীর উৎসও তেমনি তিনি স্বয়ং। জীবন ও সাধনার মতো তাঁর বাণীও দৈবপ্রেরিত। তাঁর ধর্ম যেমন পুঁথিগত নয়—সাক্ষাৎ অনুভূত তত্ত্ব, তেমনি তাঁর অধ্যাত্ম-উপদেশও শাস্ত্র-নির্ধারিত বচন নয়, অনুভূতির সহজ সাবলীল প্রকাশ। জগতকে খুব নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। জগতে যেখানে যা কিছু দেখেছেন তাকেই উপমা হিসেবে তিনি কাজে লাগিয়েছেন ধর্মালোচনার যথাযোগ্য স্থানে—যাতে দর্শন বা তত্ত্বের জটিল কথা, ভাবের আবেগে কোমল হয়ে শ্রোতার একেবারে মর্মস্থলে প্রবেশ করে তার হৃদয়কে আলোড়িত করে।

কঠিন তপস্যার দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে জগন্মাতার দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করেন। অতঃপর বিভিন্ন মতে ও পথে সাধন করে বিভিন্ন ধর্মের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে উপলব্ধি করেন যে সকল ধর্মের উদ্দেশ্য এক, ভেদ শুধু সাধনপ্রণালীতে। ভারতের সমাজজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে যখন ঘোর দুর্যোগ নেমে এসেছে, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে চলেছে প্রচণ্ড আলোড়ন, ঠিক সেই সময়ে ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের চলার পথের দিক নির্ণয় করতেই যেন দৈব নির্দেশে তাঁর আবির্ভাব। কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ অর্জন করলেন, এবং সেই সাধনলব্ধ ফল সমগ্র মানবসমাজকে প্রাণভরে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হলেন। আনন্দের উপলব্ধিকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলে আনন্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, আর এ তো পরমাত্মা-প্রসূত পরমানন্দ লাভ। একে শ্রীরামকৃষ্ণ দুহাতে বিলিয়েছেন ধনী-দরিদ্র, ত্যাগী-গৃহী নির্বিশেষে, ধর্ম-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে। জীবনের প্রথম অংশ তিনি ব্যয় করেছেন বিচিত্র মতপথের চরম উপলব্ধির আনন্দ লাভের চেষ্টায়, আর শেষাংশ ব্যয় করেছেন সেই আনন্দের অকৃপণ দানে। তাঁর অমৃত-নিষ্যন্দিনী বেদবাণী সংসার-তাপদগ্ধ মৃতপ্রায় মানবকে সঞ্জীবনী সুধা প্রয়োগে নবজীবন দান করে। দলে দলে মানুষ তাঁর উপদেশ শুনতে আসত, সংসারাসক্ত বেদনাকাতর মানুষ আসত জ্বালা জুড়োতে। সকলের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। লক্ষণীয়, নীরস তত্ত্বকথা অথবা গুরুগম্ভীর দার্শনিক আলোচনা বলে কেউই নিরুৎসাহ হত না। বরং বারবার একই কথা তারা শুনতে চাইত আফিমের নেশা-ধরা ময়ূরের মতো। তারা ফিরে ফিরে আসত ঠাকুরের অমৃতবাণী শুনে পরমানন্দ লাভের জন্য। তাঁর বচনামৃতের আকর্ষণই ছিল আফিমের মৌতাত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আমরা দেখি, ঠাকুর তাঁর ভক্তমণ্ডলীর কাছে একই ধরনের উপদেশ বারবার উচ্চারণ করেছেন, হয়তো তাদের দৈবী সত্তার উদ্ঘাটনের নিমিত্ত অথবা আধ্যাত্মিক পথযাত্রায় সতর্ক রাখার জন্য। এর মধ্যে একটি হল, 'আমি

মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। সত্যিই এই 'আমি' বস্তুটি জীবনে সকল যন্ত্রণার মূল কারণ। 'আমি'ই যত রকম বন্ধন রচনা করে মানবজীবনকে দুঃখ-শোক-সমস্যা-সংকটে জীর্ণ করে। 'আমি' বা 'অহং'-এর অবস্থানে যে কত দুর্গতি হয় ঠাকুর তার ব্যাখ্যা করেছেন অচিন্তনীয় একটি উপমার সাহায্যে : ''গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে তাই এত দুঃখ! সমস্ত দিন লাঙল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিংবা তাকে কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতা তৈয়ারি করে। অবশেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুনুরীর হাতে পড়ে যখন তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) করে, তখন নিস্তার হয়।"[১] যতক্ষণ 'আমি আমি' থাকে ততক্ষণ দুঃখ-যন্ত্রণা। অতএব যন্ত্রণার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে চাই ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ—'হে ঈশ্বর, আমি নই তুমিই কর্তা, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'—তবেই সকল দুঃখের অবসান। বেদান্ত বলছেন, এই অহংটির সৃষ্টি সম্পূর্ণ অজ্ঞান থেকে। আমাদের অন্তঃকরণ মায়াজাত চারটি উপকরণে রচিত—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। তার মধ্যে অহংকার বস্তুটি মায়ার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। আমাদের এই অহংসত্তাই আত্মার আলোয় প্রকাশিত হয়ে আত্মাকে জুড়ে দেয় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে এবং নিজে সাক্ষিস্বরূপ আত্মার প্রতিনিধি হয়ে জীবাত্মারূপে আমাদের অন্তর্জগতে প্রভুত্ব করে। সাক্ষিস্বরূপ আত্মার সঙ্গে অহং-এর এই সংযোগ সম্পূর্ণ অজ্ঞানতাবশত। চেতনার আলোয় চিত্ত উদ্বোধিত হলেই এই অজ্ঞান মুছে যাবে, তখন আমরা আত্মস্বরূপের সত্য পরিচয় পাব।

শ্রীরামকৃষ্ণও ভক্তদের কাছে সেই কথাই সহজ হৃদয়গ্রাহী করে বুঝিয়ে বলেছেন, কখনও সংগীতের মাধ্যমে, কখনও উপমার সাহায্যে। তিনি বলেছেন : আমি করছি এইটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর তুমি কর্তা আর আমি অকর্তা; তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র এইটির নাম জ্ঞান। ''যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।"[২] ঈশ্বরনির্ভরতাই তদ্‌গতচিত্ত ভক্তের জীবনের একমাত্র সম্পদ—'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। রবীন্দ্রনাথ অন্তর্যামীর কাছে অহংবিনাশের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে গাইছেন : ''আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে/ তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে। (গীতাঞ্জলি ১)

'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান—শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে একথা শুনে কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন, ''মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না।" বস্তুত এই আমিটি না হলে জাগতিক মানবের এক মুহূর্তও চলে না। আমাদের সকল চিন্তাভাবনা কাজকর্মের সঙ্গে সর্বদা এই 'আমি'টিই তো জুড়ে থাকে। এমনকী ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে হলেও তার সাহায্য চাই, যদিও তাকে সঙ্গে নিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না। অতএব এই আমিটিকে ত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না, সংসারী মানুষ এমন কথাই ভাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই কেশবকে উত্তরে বলছেন, ''কেশব, তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না, তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর।"[৩] ঠাকুরের মুখে এক নতুন কথা শোনা গেল। আমি-রও কাঁচা-পাকা? 'কাঁচা আমি' ও 'পাকা আমি' এই শব্দদুটি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব সৃষ্টি। যে-আমি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেটি হল 'পাকা আমি', আর যা শুধুমাত্র ব্যক্তির সঙ্গে আপন স্বার্থে যুক্ত, তা হল 'কাঁচা আমি'। তাই 'আমি'-'আমার' এই শব্দগুলি 'কাঁচা আমি' রূপে মানবের অহংকারকেই চিহ্নিত করে। একেই আমরা সার মনে করে রাত্রদিন ব্যবহার করি ও মায়ার জগতে অচেতন হয়ে থাকি। দেহ-মন-বুদ্ধির সীমিত সংকীর্ণ গণ্ডিতে এই অহং-এর জন্ম, তাই তার অস্তিত্বও সীমিত-সংকীর্ণ।

কিন্তু এর পিছনে আর এক মহৎ 'আমি' আছেন সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান; যাঁর অবস্থানেই এই 'ক্ষুদ্র আমি'র অস্তিত্ব, পরিচয়, কর্মশীলতা, সবকিছু নির্ভর করে, তিনিই পাকা আমি। তাঁর কথা আমরা একরকম ভুলেই থাকি। তিনি আমাদের অন্তরে অন্তরাত্মারূপে বিরাজমান। তিনি আনন্দময়-প্রেমময়-জ্যোতির্ময় চৈতন্যস্বরূপ, সর্বভূতের অন্তরে অবস্থিত শাশ্বত পরমসত্তা। আমাদের কর্ম, আমাদের বিশ্বাস সব কিছু তাঁর চরণে সমর্পণ করে দিয়ে তাঁর দাসানুদাস হয়ে অবস্থান করতে পারলেই মানবজনম সার্থক। তাই ঠাকুর নির্দেশ দিচ্ছেন 'দাস আমি', 'বিদ্যার আমি', 'ভক্তের আমি' হয়ে থাকার, বলছেন 'এরই নাম পাকা আমি'। আর ''আমি কর্তা, আমার স্ত্রী পুত্র, আমি গুরু—এসব অভিমান কাঁচা আমি।''[৪] বিদ্যার অভিমান, ধনের বা বংশমর্যাদার অভিমান, গুণের অভিমান এসবই আমাদের অহংকারজাত। আমরা সেই ক্ষুদ্র অহংকারের ঘেরাটোপে নিশিদিন বন্দি হয়ে আছি।

অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন : ''অহংকার না গেলে জ্ঞানলাভ করা যায় না। উঁচু ঢিপিতে জল জমে না। খাল জমিতে চারিদিককার জল হুড়হুড় করে আসে।''[৫]—কী অপূর্ব ভঙ্গি! উপমার অলংকারে সজ্জিত দুটি ছোট বাক্যে দুধরনের ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল। একটি শুধুই ধারাপাতে সিক্ত উঁচু টিলা, এককোঁটা জলও তার ধরে রাখার ক্ষমতা নেই, যতই সে মাথা উঁচু করে আপন উচ্চতাকে সগর্বে ঘোষণা করুক। আর অপরটি নম্র বিনীত নিরহংকার খাল জমি, যে সবার পদতলে লুটিয়ে আছে কিন্তু বুকে ধরে আছে ঈশ্বরের করুণারূপ ধারাপাত, এবং জমিতে অবস্থিত সকল অবাঞ্ছিত শরণার্থী জলধারাকে। এত কথা তো শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ব্যাখ্যায় রাখেননি, কিন্তু ওই দুটি বাক্যই মনের মাঝে দুটি জমির ছবি এঁকে জাগিয়ে তুলল এত ভাবনা। এখানেই তো উপমার বাহাদুরি। সাধারণ অজ্ঞান মানবের আর বুঝতে বাকি রইল না যে, ''আমি রূপ ঢিপিতে ঈশ্বরের কৃপা রূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়'' অর্থাৎ অহংকারের উঁচু টিলায় বসে করুণাময় ভগবানের করুণা লাভ করা যায় না, জীবনের পরমপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়। অহংকারই, আমাদের মায়ায় ঘেরা পার্থিব জগতের আকর্ষণে পরিচালিত করে জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। জীবের অহংকারই মায়া। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ''জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে,... এক-একটি উপাধি হয়, আর জীবের স্বভাব বদলে যায়।'' আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ে যায় একটি হাস্যরসাত্মক গল্প—এক ব্যাঙের একটি টাকা ছিল, তার গর্তে রাখা। এক হাতি সেই গর্তটি ডিঙিয়ে যায় দেখে রেগে গিয়ে ব্যাঙ তাকে লাথি দেখায়, আর বলে : কী! তোর এত বড় স্পর্ধা যে আমায় ডিঙিয়ে যাস! ঠাকুর বলছেন : ''টাকার এত অহংকার।''[৬]

কত সুন্দরভাবে এই ছোট্ট গল্পটির সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণ মানবচিত্তের অহংকারের ভয়ংকর রূপটি তুলে ধরলেন। তাঁর ব্যাখ্যায় এই মায়া বা অহং যেন মেঘের মতো। সামান্য মেঘের জন্য যেমন সূর্যকে দেখা যায় না, তেমনি আমাদের অহংরূপ মেঘ জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে আড়াল করে রাখে। কিন্তু এই ছোট্ট সহজ সরল উপমাটিতে তাঁর বুঝি মন ভরল না; মনে পড়ে গেল আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের চেনা মহাকাব্য, রামায়ণের পাতা থেকে তুলে নিলেন সেই চিরপরিচিত ছবিটি—বনবাসকালে বনের পথে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ চলেছেন। আগে রাম, তাঁর পিছনে সীতা, তারও পরে লক্ষ্মণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পাচ্ছেন না, মাঝখানে সীতারূপ মায়া তাঁকে আড়াল করে রেখেছে। এভাবে বলেও যেন তিনি

তৃপ্তি পেলেন না ঠাকুর। একটি গামছা দিয়ে নিজের মুখকে আড়াল করে অভিনয়ের সাহায্যে ভক্তদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন কীভাবে মায়াজাত অহংকার আমাদের কাছ থেকে পরমেশ্বরকে আড়াল করে রাখে। করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণের কী আপ্রাণ চেষ্টা, উপমার মালা গেঁথে সাধারণ অজ্ঞান মানুষের কাছে অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার! বেদান্ত বলছেন, মানুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, কিন্তু শুধুমাত্র মায়ার প্রভাবে পরমাত্মার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে সে জীবাত্মারূপে জগতে আসক্ত হয়, অজ্ঞান অন্ধকারে পথ চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ রামসীতার কাহিনির মধ্য দিয়ে সেই একই তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, ''জীব ও আত্মার প্রভেদ হয়েছে, এই 'আমি' মাঝখানে আছে বলে।''[৭]

কিন্তু এই জীবাত্মা-পরমাত্মার তত্ত্ব কি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব? তাই শ্রীরামকৃষ্ণ আরও একটি সাধারণ পরিচিত ছবি ব্যবহার করে বললেন, ''জলের উপর যদি একটা লাঠি ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে দুটো ভাগ দেখায়। বস্তুত, এক জল; লাঠিটার দরুন দুটো দেখাচ্ছে।

''অহং-ই এই লাঠি। লাঠি তুলে লও, সেই এক জলই থাকবে।''[৮]

এরপর কি আর তত্ত্বকথার দুর্বোধ্যতা থাকে? এ-ছবি তো আমাদের চেনা। মনের মধ্যে এ-ছবি ভেসে উঠতেই, জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক অনায়াসে বোধগম্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই অহং-এর বিনাশ কী করে সম্ভব? ঠাকুর অহং-এর এই দুর্নিবার চরিত্রের ব্যাখ্যা করে ছোট্ট একটি উপমা তুলে ধরেছেন : ''হাজার বিচার কর, 'অহং' ফিরে এসে উপস্থিত। আজ অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, কাল আবার সকালে দেখ ফেঁকড়ি বেরিয়েছে।''[৯] কী নিখুঁত উপমা, বহুপরিচিত কত প্রাসাদ কত প্রাচীরের জীর্ণ পুরাতন শরীর এর সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। আমাদের 'আমি'টিও এইরকম, যতই মনে করি মুছে দিতে পেরেছি, আবার কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়ায়। জীবনের ওপর আরোপিত উপাধিগুলি থেকেই তাদের জন্ম, মায়ার বশে মানব সেগুলিকেই বুকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চায়। ঋষি কবিও এই দর্শনটিকে তুলে ধরেছেন : ''ছাড়াতে চাই অনেক করে,/ ঘুরে চলি যাই যে সরে,/ মনে করি আপদ গেছে—/ আবার দেখি তারে...।'' (গীতাঞ্জলি-১০৩) শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্ণ অহং-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি, তার বিনাশের সহজ উপায়ের সন্ধান দিয়ে সমস্যার সমাধানও করেছেন। বলেছেন, ''তবে থাক শালা 'দাস-আমি' হয়ে।'' অর্থাৎ এই ক্ষুদ্র আমির মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে মনে করতে হবে, আমি ঈশ্বরের সন্তান, প্রভুর দাস। তিনি বলেন, '' 'দাস আমি', কি 'ভক্তের আমি', কি 'বালকের আমি'—এরা যেন আমির রেখা মাত্র।''[১০] আমি দাস তুমি প্রভু—এই অভিমান অভ্যাস করতে পারলেই ঈশ্বরলাভ। ঠাকুরের মতে এ যেন সোনার তরোয়াল, যাতে বিন্দুমাত্র ধার নেই, কাটে না। ঈশ্বরে সমর্পিত আমিত্বের কোনও অহংকার থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগী সন্ন্যাসীদের স্বতন্ত্র স্থান স্বীকার করলেও সংসারীদের কখনও নিরাশ করেননি, বরং বলেছেন : ''সংসারত্যাগী সাধু—সে তো হরিনাম করবেই।... সে যদি হরিনাম না করে তাহলে বরং সকলে নিন্দা করবে। সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তাহলে বাহাদুরি আছে।''[১১] ঠাকুর গার্হস্থ্য জীবনে অবস্থান করে ঈশ্বরের আরাধনা করাকে কেল্লার ভেতর থেকে যুদ্ধ করার সঙ্গে তুলনা করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিরন্তন যে-আদর্শ, যা ধর্মের মূল বক্তব্য, তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্র-নির্দেশিত ধর্মের এই মূল মন্ত্রটি হল ত্যাগ ও বৈরাগ্য। সংসারী ভক্ত প্রশ্ন করে : ''মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?'' ঠাকুর সাহস ও উৎসাহ দিয়ে

বলেন, ''নাগো! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে-বশে বেশ আছ।'' বলেন, ''তোমরা সংসার করছ—এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না।''[১২] চৈতন্যদেব বলেন, ''শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই/ সংসারী জীবের কভু গতি নাই''—অর্থাৎ যার মনে সংসার বা আসক্তি, তার মুক্তি নেই। পূর্ণ অনাসক্তি না এলে জীবের মুক্তি হয় না। কারণ আসক্তিই সব দুঃখের, সব বন্ধনের কারণ। করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী মানুষকে সংসারের বা আসক্তির মোড়টি ঘুরিয়ে দিতে শিখিয়েছেন। ঈশ্বরে মন রেখে সংসার করলে কোনও দোষ নেই। তিনি বলতে চান, সংসার করা দোষযুক্ত না হলেও, সংসারে আসক্ত হয়ে থাকা বা ভগবানকে ভুলে সংসারে ডুবে থাকায় ঘোরতর বিপদ। তাহলে সংসার জাগতিক দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়ে বন্ধন রচনা করবে এবং ভগবৎপ্রাপ্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এই দার্শনিক তত্ত্বটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সার্থক ও তাৎপর্যপূর্ণ উপমা তুলে জলে নৌকো থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকোয় যেন জল না থাকে। অর্থাৎ সংসারে থেকে সংসারধর্ম পালন করায় কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু সংসার যেন আমাদের মনে প্রবেশ না করে, এবং সেটিই হল সংসারজীবনে বৈরাগ্য বা নির্লিপ্ততার পরিচয়। সাংসারিকতার মায়াময় প্রভাব যদি সংসারাসক্ত মানবচিত্তকে গ্রাস করে তবে স্বখাত সলিলে ডুবে মরা ছাড়া অন্য কোনও গতি নেই। তখন পরমেশ্বরের কাছ থেকে মানব অনেক দূরে সরে যায়, হারিয়ে ফেলে জীবনের পরম উদ্দেশ্য। ঠাকুর তাই সংসারী মানবকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকো। গার্হস্থ্য জীবনে থেকেও কীভাবে অধ্যাত্মজীবনের পথে চলা যায় তারই পথনির্দেশ করেছেন তিনি। সংসারী মানুষ ভাবে, তা কেমন করে সম্ভব? সংসার রচনায় অথবা সাংসারিক কর্মে যদি অনুরাগ না থাকে তবে সে-কর্ম সফল হবে কেমন করে?—এইখানেই তো আধ্যাত্মিকতার বাহাদুরি! গীতা বলেছেন, 'মা ফলেষু কদাচন।' সংসারী মানব কর্ম নয়, কর্মফলের প্রতি আসক্ত হয়, যা থেকে আসে যাবতীয় দুঃখবেদনা। তাই সংসারী মানবের প্রতি গীতার নির্দেশ : 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি'—ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ম করো, অর্থাৎ ঈশ্বরের উদ্দেশে কর্ম করে, তবেই কর্ম উপাসনায় পরিণত হবে এবং চিত্তে আসবে নির্লিপ্ততা। শ্রীরামকৃষ্ণও মনের মধ্যে সেই নির্লিপ্ততা রচনা করার পথ বলে দিলেন। প্রতিদিনের জীবন থেকে একটি সহজ সরল উদাহরণ সংগ্রহ করে পরিবেশন করলেন সংসারী মানুষের কাছে। বললেন—বড় লোকের বাড়ির দাসীর মতো থাকো। দাসী মনিবের বাড়িকে দেখিয়ে বলে, 'আমাদের বাড়ি'। মনে জানে যে ও-বাড়ি আমাদের নয়, আমাদের বাড়ি সেই পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে আর বলে, 'হরি আমার বড় দুষ্টু হয়েছে।' 'আমার হরি' মুখে বলে বটে, কিন্তু জানে যে হরি মনিবের ছেলে। ঠিক এইভাবে সংসারী মানুষদের মনে করতে হবে যে, এই ঘরবাড়ি পরিবার পরিজন কিছুই আমার নয়, সবই ঈশ্বরের। সংসারী মানুষের কাছে এই হল বৈরাগ্য।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর ব্যাখ্যায় পাই, ত্যাগ বা বৈরাগ্য কোনও নেতিবাচক শব্দ নয়। ত্যাগ হল কিছু ছেড়ে দিয়ে কিছু পাওয়া, অর্থাৎ জগৎসংসার থেকে মন সরিয়ে নিয়ে সে-মন ঈশ্বরকে দেওয়া। ঠাকুরের মতে ঈশ্বরে অনুরাগ হলে আপনিই সংসার আলুনি লাগবে, বিষয় বিষ মনে হবে। করুণাময় ঠাকুর তাই সংসারী মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছেন : ''একহাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে আর একহাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাকবে, তখন নির্জনে বাস করবে, কেবল তাঁর চিন্তা

ও সেবা করবে।"[১৩] এটিই মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য। এর মধ্যে যেন কোনও ফাঁকি না থাকে, সর্বদা যেন ঈশ্বরেই মনটা পড়ে থাকে। তিনি আরও বলেছেন, তাঁকে জেনে সংসার করলে কোনও দোষ নেই, তখন আর সংসার অনিত্য হয় না, কারণ সবই তো তাঁর। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে এই সত্যই ঘোষিত হয়েছে :''ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" সমগ্র জগৎ ঈশ্বরে পরিব্যাপ্ত। তাই ঈশ্বরে অনুরাগ নিয়ে সংসারে প্রবেশ করলে জীবনে দুঃখ-বেদনার আর কোনও ভয় থাকে না। সংসারীদের কাছে এই তত্ত্বটিই শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছেন বিখ্যাত দু-একটি উপমার সাহায্যে। যথা—'হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আঠা লাগে না', অথবা 'চোর চোর খেলায় বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নেই।' অর্থাৎ সংসার যতই যন্ত্রণাদায়ক হোক না কেন, সংসারের সকল কর্মের মধ্যে আমি ঈশ্বরের সেবা করছি, একথাটি যদি অন্তরে ধরে রাখা যায় তবে কর্মের মধ্যেও পরমানন্দ লাভ হয়। মায়ার অন্ধকারে আচ্ছন্ন জগতে পথ চলতে চলতে অজ্ঞান মানুষ আলোর ঠিকানা হারিয়ে ফেলে, ঈশ্বরবিশ্বাস দিনদিন ক্ষীণ হয়ে আসে, এমনকী আত্মবিশ্বাসও ক্রমশ ম্লান হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কোনও গৃহী ভক্ত যখন অবিশ্বাসের চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—''মহাশয় গৃহস্থাশ্রমে কি ভগবান লাভ হয়?" ঠাকুর সহাস্যে উত্তর দেন, ''কেন হবে না? পাঁকাল মাছের মতো থাক। সে পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক নাই।"[১৪] নির্লিপ্ততা বা বৈরাগ্যের এত ভাল, এত উপযুক্ত উপমা আর কি হতে পারে? বাংলা সাহিত্যে উপমা অনেক দেখা যায়, কিন্তু জাগতিক উপমার এমন পারমার্থিক উত্তরণ বড় একটা দেখা যায় না। এখানেই কথাশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের অনন্যতা। ঠাকুর কিন্তু ওইটুকু বলে শান্তি পেলেন না। এত সহজ উপমাকে আরও সহজ করে বোঝাতে চেয়ে বলছেন পাঁকাল মাছের মতো থাকার উপায়টি কী। সেটি হল, সংসার থেকে তফাতে গিয়ে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা। যা করলে ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মায় এবং নিরাসক্ত চিত্তে সংসারে থাকা যায়। তখন সংসারে থাকলেও সাংসারিকতার মালিন্য চিত্তকে স্পর্শ করে না। এই ঈশ্বরনির্ভরতাই মানবজীবনের পরম সম্পদ। ঠাকুর গৃহী বা সন্ন্যাসী সকলকে সর্বদা এই শরণাগতির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। শরণাগতিই মানবকে পরাগতির পথে পরিচালিত করে পৌঁছে দেবে সেই পরমসত্তার কাছে। অতএব সকল সময় সর্বক্ষেত্রে ঈশ্বরকে ধরে থাকতে পারলেই সকল দুর্গতির অবসান। কিন্তু কেমন করে ধরে থাকতে হবে? এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি যথোপযুক্ত উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বরনির্ভরতার মাত্রাখানি কেমন হলে সুদৃঢ় হবে। তাঁর বক্তব্য, বাঁদরছানার মতো নয়, বিড়ালছানার মতো ধরতে হবে ঈশ্বরকে। বাঁদরছানা তার দুর্বল অক্ষম দুটি হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে থাকে, মা গাছ থেকে গাছে লাফ দেয়। হয়তো সে নিশ্চিন্তে থাকে, কিন্তু তার দুর্বল হাতের বাঁধন যদি দৈবাৎ ছিন্ন হয় তখনই বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু বিড়ালছানা? সে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে থাকে। মা তাকে কেমনভাবে নিয়ে যাবে, কোথায় রাখবে তা নিয়ে তার কোনও চিন্তা নেই। মা যা করবে তাতেই সে নিশ্চিন্ত। ঠাকুর বোঝাতে চাইছেন, এই হল শরণাগতি, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিধা-সংশয়ে আচ্ছন্ন অর্জুনকে শেষপর্যন্ত এই শরণাগতির কথা বলেই নিশ্চিন্ত করতে চেষ্টা করেছেন, ''সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"—ধর্মাধর্ম সব ত্যাগ করে তুমি আমার শরণাগত হও। ''অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (১৮।৩৬)—সকল পাপ থেকে আমি তোমায় মুক্তি দেব। শোক কোরো না, দুঃখ কোরো না।

একই কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বুঝিয়েছেন ভক্তদের : সকল কাজে সকল সময়ে শুধু ঈশ্বরকে ধরে থাকো, তাহলে আর কোনও দুঃখ-যন্ত্রণা ভয়-ভাবনা থাকবে না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি সার্থক উপমা ঠাকুর আমাদের উপহার দিয়েছেন। ''যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চলছে সে ছেলে বরং অসাবধান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিলে খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।''[১৫] বাপ যে-ছেলের হাত ধরে সে-ছেলে বেড়ালছানার মতো। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ নির্ভরতায় বিশ্বাসী সে। এমন ভক্ত ঈশ্বরকে আমমোক্তারি দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকে। আর যে-ছেলে বাপের হাত ধরে সে বাঁদরছানার মতো, যার একটু কর্তৃত্ববোধ আছে—আমি নিজের চেষ্টায়, আমার নিজ সাধনার দ্বারা, পূজা-উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরকে ধরে থাকব। দুজনেই ভক্ত, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য—যদিও দুজনেরই পরম লক্ষ্য উত্তরণ। এই দুই থাকের ভক্তের সঙ্গে তুলনীয় এমন সহজ দৃষ্টান্ত, এমন গভীর উপলব্ধির উপমার জোড়া মেলা ভার। এই দুই স্বভাবের ভক্তের মধ্যে ঠাকুরের কাকে পছন্দ বিচার করলে দেখব, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পরম নির্ভরতাকেই তিনি সব থেকে বেশি পছন্দ করেন, কারণ তিনি নিজে ছিলেন সম্পূর্ণ মাতৃনির্ভর। কাজে, কথায় সবক্ষেত্রেই তিনি মহামায়ার নির্দেশ ব্যতীত এক পা-ও চলতেন না। ভক্তদের কাছেও তাই ঈশ্বরনির্ভরতার উপদেশ দিয়ে বলেছেন, এই হল জীবনপথে চলার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

কিন্তু মায়ায় বদ্ধ জীব ভোগাসক্তিতে ডুবে থাকতেই ভালবাসে, মুক্তির কোনও ইচ্ছাই তাদের থাকে না। তবে একথাও ঠিক যে সংসারের সব মানুষই তেমন নয়। ঠাকুর তাই জীবকে তথা মানবকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, এবং সেই চার থাকের জীবের সঙ্গে চারপ্রকার মাছের তুলনা করেছেন। বলেছেন : ''জেলের জালে যখন মাছ পড়ে, কতকগুলো মাছ জাল ছিঁড়ে পালাবার অর্থাৎ মুক্ত হবার চেষ্টা করে। এদের মুমুক্ষুজীব বলা যায়।... দু-চারটা মাছ ধপাঙ্ শব্দ করে পালায়;... এই দু-চারটা লোক মুক্তজীব। কতকগুলি মাছ স্বভাবত এত সাবধান যে, কখনও জালে পড়ে না। নারদাদি নিত্যজীব কখনও সংসারজালে পড়ে না। কিন্তু অধিকাংশ মাছ জালে পড়ে; অথচ এ-বোধ নাই যে, জালে পড়েছে মরতে হবে। জালে পড়েই জাল-শুদ্ধ চোঁ-চা দৌড় মারে ও একেবারে পাঁকে গিয়ে শরীর লুকোবার চেষ্টা করে। পালাবার কোন চেষ্টা নাই বরং আরও পাঁকে গিয়ে পড়ে। এরাই বদ্ধজীব।... বদ্ধজীবের—সংসারী জীবের কোন মতে হুঁশ আর হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।''[১৬]

মায়ায় বদ্ধ অসহায় সংসারী জীবের জন্য তাঁর করুণাঘন চিত্তের কী মর্মন্তুদ অন্তর্বেদনা, জগতের অজ্ঞান মানুষগুলিকে মায়ায় ঘেরা অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে টেনে তোলার কী প্রাণান্তকর চেষ্টা! অজ্ঞান মানুষগুলির জন্য নিরন্তর অশ্রু ঝরত তাঁর অন্তরে। মায়ায় বদ্ধ অসহায় জীবগুলির জন্যই তাঁর সারাটি জীবন কেটেছে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায়। তাই জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছে যখন শুনেছেন, নরেন শুকদেবের মতো সমাধিতে লীন হয়ে থাকতে চান, তখন তাঁকে তিরস্কার করেছেন : ''ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিসনি। ''[১৭] আবার শ্রীশ্রীমাকে নিজের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে বলেছেন : ''কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল

করছে। তুমি তাদের দেখবে।"[১৮]

সংসারাসক্ত অসহায় মানুষের আর একটি করুণ ছবিও শ্রীরামকৃষ্ণ তুলে ধরেছেন উপমার সাহায্যে : যথা—''উট কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না।"[১৯] সংসারী মানুষ এত কষ্টের মধ্য দিয়ে চলে তবু সংসারকে ছাড়ে না। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ, এই অনিত্য জগতে দুঃখের নিবৃত্তি নেই, তাই অনিত্য বস্তুর আসক্তি ত্যাগ করে আমার ভজনা করো। কিন্তু সংসারাসক্ত মানবের সেই পরমবাণী শ্রুতিগোচর হয় কই? ঈশ্বরচিন্তার অবকাশ নেই তাদের। অবশ্য ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত তা বোধহয় সম্ভবও নয়। তিনিই আমাদের বন্ধন ও মুক্তি দুয়েরই অধিকর্তা।

বদ্ধ জীবের মতো মুক্তজীব বা ব্রহ্মজ্ঞানীর পরিচয়টিও উপমার সাহায্যে স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উপনিষদ বলেছেন, ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর। সাধারণ মানুষ তো দূর, যাঁরা তাঁকে জেনেছেন, তাঁরাও তাঁর পরিচয় দিতে পারেন না, আপন আপন অপার্থিব ব্রহ্মোপলব্ধির কথা জানাতে পারেন না। ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত মানবের সেই বিমুগ্ধ হতবাক অবস্থার ছবি এঁকেছেন নুনের পুতুলের সমুদ্রে মিশে যাওয়ার উপমা দিয়ে। এ এক অনুপম উপমা : ''নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল, একটু নেমেই গলে গেল। 'তদাকারকারিত'। তখন কে আর উপরে এসে সংবাদ দেবে, সমুদ্র কত গভীর!"[২০]—এই হল পূর্ণ জ্ঞানীর লক্ষণ। পূর্ণ জ্ঞানে মানুষ শান্ত ও নীরব হয়ে যায়। তার দেহবোধ চলে যায়, চিত্তহ্রদেও কোনও তরঙ্গ ওঠে না। শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবস্থার ব্যাখ্যা করে বলছেন, সপ্তমভূমিতে পৌঁছলে মনের নাশ হয়, অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিতে সাধকের সীমিতসত্তা অসীমে বিলীন হয়। বিচার করার মতো আমিত্বটুকুও হারিয়ে ফেলে সে। যার আমিকেই খুঁজে পাওয়া যায় না, সে আর কার খোঁজ দেবে। সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ কে বলবে? সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত জলপূর্ণ মাটির কলসিকে যদি সমুদ্রেই ভেঙে দেওয়া যায় তবে কলসির জল ও সমুদ্রের জল মিলেমিশে একাকার হয়, তেমনই সমাধির পর মানবের সীমিত সত্তা চেতনার অনন্ত সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। 'আমিত্বলোপের' মতো দুর্বোধ্য বেদান্ততত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি অসামান্য চিত্র রচনা করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যা অত্যন্ত পরিচিত, এবং কত সহজে শব্দের অন্ধকার ভেদ করে বোধির আলো পৌঁছে গেল সেখানে। এভাবেই তাঁর প্রতিটি উপমা আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায়, সহজ সরল পরিবেশনায়, জীবনের স্পর্শে কথাসাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্যতা দাবি করে।

কথামৃতের পাতায় পাতায় যুক্ত হয়েছে তাঁর উপমাসমৃদ্ধ এমন অনেক বাণী, যা পাঠকচিত্তকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে। অনুভূতির চিত্র রূপায়ণে শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পিসত্তা পরম সত্যকে প্রকাশ করেছে দৃশ্যজগতের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে। তাঁর বাণীতে রয়েছে পাণ্ডিত্য ও ভাষাশিল্পের সার্থক সম্মিলন। প্রচলিত উপমার পরিবর্তে এই যে জীবনের স্পর্শে সজীব উপমার ব্যবহারে তাত্ত্বিক বা দার্শনিক আলাপচারিতা, এতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন নিপুণ কথাশিল্পী। তাঁর বাণী ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের জন্য তাই কথামৃতকেই হাতে তুলে নিতে হয়। উপমার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে বহুল প্রচলিত। কিন্তু এমন করে মানবাত্মার উদ্বোধনের জন্য মানবজীবনের পাতা থেকে উদাহরণ খুঁজে তুলে ধরা বিরল। না, শ্রীরামকৃষ্ণকে বেশি খুঁজতে হয়নি, ভাবতেও হয়নি, তাঁর স্বচ্ছন্দ-সাবলীল উপমা প্রয়োগে সেকথা বেশ বোঝা যায়। এ-ব্যাপারে তিনি নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি জানতেন শুধুমাত্র তত্ত্বোপদেশ শোনার জন্যই নয়, তাঁর

উপমাসমৃদ্ধ বাণীর আকর্ষণেও অগণিত মানুষ তাঁর কাছে আসে। তাই মণি মল্লিক যখন তাঁকে বলেন, ''আপনি ওখানে একবার গেলে আমাদের ১০-১৫ বৎসর উপদেশ চলত।'' শ্রীরামকৃষ্ণ তখন হেসে উত্তর দেন : ''কি, উপমার জন্য?''[২১]

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা যেমন তাঁর অন্তরের ধ্যানলোক থেকে উৎসারিত, তেমনি তার প্রয়োগকৌশলও তাঁর স্বভাবদক্ষতার পরিচয় বহন করে। অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ততাই কথাসাহিত্যের পরম সম্পদ। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের 'রসদ্‌দার' তাঁর 'মা'—জগজ্জননী। তিনি নিজেই বলেছেন : ''আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন!''[২২] অতএব তাঁর বাণী যেন গচ্ছিত দৈবী সম্পদ—যা শুধু তাঁকেই সমৃদ্ধ করেনি, বাংলা সাহিত্যকেও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। কথামৃতের উপমার ঐশ্বর্য বাংলা সাহিত্যকে শুধু গৌরববান্বিতই করেনি, সেই উপমার মালা গেঁথে শ্রীরামকৃষ্ণের সাহিত্যকীর্তি চিরকালের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। সবশেষে এইপ্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত মনীষী প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের মন্তব্যখানি বিশেষভাবে স্মরণীয়, '' 'কথামৃতে'র উপমা, সে এক আশ্চর্য জিনিস। আমি উপমার গদীর মালিকের (রবীন্দ্রনাথের) কাছে বছরের পর বছর কাটিয়েছি। উপমার ঐশ্বর্য কাকে বলে জানি।... কিন্তু 'কথামৃতে'র উপমা আমাকে চমকে দেয়—এ কী কাণ্ড তিনি করে গেছেন! আগে জেনেছি, উপমা কালিদাসস্য, পরে বলেছি, উপমা রবীন্দ্রনাথস্য, এখন বলছি, উপমা রামকৃষ্ণস্য।''[২৩] ✠

তথ্যসূত্র

১। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), অখণ্ড, পৃঃ ৯২৯ [এরপর, *কথামৃত*]
২। পৃঃ ১২০
৩। পৃঃ ২৪৪
৪। দ্রঃ তদেব
৫। পৃঃ ৯৪৪
৬। দ্রঃ পৃঃ ১২০
৭। পৃঃ ১২১
৮। তদেব
৯। তদেব
১০। পৃঃ ১২২
১১। পৃঃ ১৫৫
১২। পৃঃ ৮৭
১৩। পৃঃ ৬৬০-৬১
১৪। পৃঃ ২১৫
১৫। পৃঃ ৯৩১
১৬। পৃঃ ১১৫
১৭। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *যুগনায়ক বিবেকানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১), খণ্ড ১, পৃঃ ১৫১
১৮। *শ্রীশ্রীমায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), অখণ্ড, পৃঃ ১৭৩
১৯। *কথামৃত*, পৃঃ ১১৫
২০। পৃঃ ১৫৯
২১। পৃঃ ৩৯৮
২২। পৃঃ ৯৬৪
২৩। সম্পাদনা : স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, স্বামী চৈতন্যানন্দ, *বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৩), পৃঃ ৮৮২

নিবোধত কার্যালয়ের ছুটির বিজ্ঞপ্তি

২ মার্চ ২০১৮ দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কার্যালয় সারাদিন বন্ধ থাকবে।